কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৬
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৩

সূরা আন-নাযি'আত

সূরা আন-নাযি'আত কোরআনের ৭৯তম সূরা। আয়াত সংখ্যা ৪৬, রুকু সংখ্যা ২ এবং সূরাটি মাক্কী সূরা। সূরার নামের অর্থ النازعات (আন-নাযি'আত) - নির্মমভাবে আত্মা হরণকারী ফেরেশতাগণ।

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالنَّازِعَاتْ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আম্মা ইয়াতাসা-আলূনা"-র পরে এ সূরাটি নাযিল হয়। এটি যে প্রথম দিকের সূরা তা এর বিষয়বস্তু থেকেও প্রকাশ হচ্ছে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় অত্র সূরাটিরও প্রধান বিষয়বস্তু হল ক্বিয়ামত বা পুনরুত্থান। সূরাটির বিষয়বস্তু সমূহকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-

(১) মৃত্যুর ফেরেশতাগণের শপথ ও তাদের কার্য সমূহ বর্ণনা (১-৫ আয়াত)।

(২) ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের বর্ণনা (৬-৭)।

(৩) অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা (৮-১২)।

(৪) অবিশ্বাসীদের কথার জবাব (১৩-১৪)।

(৫) মূসা ও ফেরাঊনের বর্ণনা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান (১৫-২৬)।

(৬) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা (২৭-৩৩)।

(৭) বিচার দিবসে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের কৃতকর্ম স্মরণ ও দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা (৩৪-৪১)।

(৮) ক্বিয়ামত কবে হবে তার জওয়াব এবং সে সময় লোকদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা (৪২-৪৬)।

ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য

১. এটি 'মুফাসসাল' (সংক্ষিপ্ত) শ্রেণীর সূরাগুলোর অন্যতম, যা দ্বারা নবী (ﷺ)-কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ওয়াছিলা ইবনুল আসক্বা' (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: "...এবং মুফাসসাল দ্বারা আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।" (আলেমদের মতে, সূরা আন-নাযি'আত 'মুফাসসাল' শ্রেণীর সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।)

২. এটি 'নাসা'ইর' (সমজাতীয়) সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা নবী (ﷺ) রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদে) পাঠ করতেন।
সূরা আন-নাযি'আত সেই সমজাতীয় সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা নবী (ﷺ) রাতের সালাতে পাঠ করতেন। যদিও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদিসে (হাদিস নং ২৮০) যে সূরাগুলোর জোড়া উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এর নাম নেই, তবে অন্যান্য বর্ণনা থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূরাহ্ আল মা'আরিজ ও সূরাহ্ আন্ নাযি'আত একই রাক্'আতে।

৩. নবী (ﷺ) যোহরের সালাতে এই সূরাটি পাঠ করতেন।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে যোহরের সালাত আদায় করেছি, তখন তিনি আমাদের জন্য (সূরা) আন-নাযি'আত পাঠ করেছেন।"

وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا

১. 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে (কাফেরের) আত্মা টেনে বের করে আনে।

এ সূরার শুরুতে কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন কোন সত্তার সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিস্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া শপথের জওয়াবও উহ্য রাখা হয়েছে। মূলত কেয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে এবং সেগুলো নিঃসন্দেহে সত্য, একথার ওপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। [কুরতুবী] অথবা কসম ও কসমের কারণ এক হতে পারে, কেননা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম।

نزعশব্দের অর্থ হল বড় শক্তের সাথে টানা। غرقًاমানে ডুবে। এটি আত্মা হরণকারী ফিরিশতার গুণবিশেষ। ফিরিশতা কাফেরদের আত্মা খুবই কঠিনভাবে শরীরের ভিতর ডুবে বের করে থাকেন। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী বলেন, ডুব দিয়ে টানা এবং আস্তে আস্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরে গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। এখানে আযাবের, সেসব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে।

وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا

২. 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের যারা মৃদুভাবে (মুমিনের) আত্মার বাঁধন খুলে দেয়'।

نشطশব্দের অর্থ হল গিরা খুলে দেওয়া। অর্থাৎ, ফিরিশতা মু'মিনদের আত্মা খুব সহজ ও মৃদুভাবে বের করে থাকেন; যেমন কোন জিনিসের গিরা খুলে দেওয়া হয়। এটা যাদের শপথ করা হয়েছে সে ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ। বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মুমিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে আনায়াসে রূহ কবজ করে- কঠোরতা করে না। প্রকৃত কারণ এই যে কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযাখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব নেয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সেদিকে যেতে চায়। [কুরতুবী]

وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا

৩. 'শপথ ঐ ফেরেশতাগণের, যারা দ্রুতগতিতে সন্তরণ করে'।

এটা তাদের তৃতীয় বিশেষণ। سبحশব্দের অর্থ হল সাঁতার কাটা। ফিরিশতা আত্মা বের করার সময় মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এমনভাবে সাঁতার কাটেন যেমন, ডুবুরীরা মণিমুক্তা খোঁজার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের গভীরে সাঁতার কেটে থাকে। অথবা অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহর হুকুম নিয়ে ফিরিশতারা খুব শীঘ্রতার সাথে আসমান থেকে যমীনে সাঁতার কেটে অবতরণ করেন। কেননা, দ্রুতগামী ঘোড়াকেও سابحবলা হয়।

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا

৪. 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা গ্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়'।

এটা তাদের চতুর্থ বিশেষণ। উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয় তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মুমিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নেয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا

৫. 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা সকল কার্য নির্বাহ করে'।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে সব কর্ম তাদেরকে অর্পণ করেন তা তাঁরা নির্বাহ করেন। পক্ষান্তরে আসল কর্মনির্বাহী হলেন আল্লাহ তাআলা। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের হিকমত অনুযায়ী ফিরিশতা দ্বারা কাজ নেন, সেহেতু তাঁদেরকেও কর্মনির্বাহী বলা হয়েছে। এই অনুপাতে উপরোক্ত পাঁচটি গুণই হল ফিরিশতাদের। আর ঐ ফিরিশতাদের আল্লাহ কসম খেয়েছেন। আর কসমের জওয়াব এখানে উহ্য আছে; অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে।" কুরআনে এই পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসের সত্যতা প্রমাণের জন্য কয়েক জায়গায় কসম ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সূরা তাগাবুন ৭নং আয়াতেও আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত বাক্যের মাধ্যমে কসম খেয়ে এই প্রকৃতত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবস কখন হবে? তার বর্ণনা আগামী আয়াতসমূহে দেওয়া হয়েছে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

৬. সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে,

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী

প্রথম প্রকম্পনকারী বলতে এমন প্রকম্পন বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় প্রকম্পন বলতে যে কম্পনে সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। [মুয়াস্সার] অন্যত্র এ অবস্থাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও আকাশসমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৮] এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর যিকর কর, তোমরা আল্লাহর যিকর কর। 'রাজেফাহ' (প্রকম্পণকারী) তো এসেই গেল (প্রায়), তার পিছনে আসবে 'রাদেফাহ' (পশ্চাতে আগমনকারী), মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির, মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির।

সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী বেশী সালাত (দরুদ) পাঠ করি। এ সালাত পাঠের পরিমান কেমন হওয়া উচিত? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। আমি বললাম, (আমার যাবতীয় দোআর) এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, অর্ধেকাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি আপনার জন্য আমার সালাতের সবটুকুই নির্ধারণ করব, (অর্থাৎ আমার যাবতীয় দোআ হবে আপনার উপর সালাত বা দরুদ প্রেরণ) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তা তোমার যাবতীয় চিন্তা দূর করে দিবে এবং তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দিবে।" [তিরমিযী: ২৪৫৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫১৩, দ্বিয়া: আল-মুখতারাহ: ৩/৩৮৮, ৩৯০]

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ

৮. অনেক হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।

“কতক হৃদয়” বলতে কাফের ও নাফরমানদের বোঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তারা ভীত ও আতঙ্কিত হবে। [মুয়াস্‌সার] সৎ মুমিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। অন্যত্র তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।” [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৩]

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ

১০. তারা বলে, আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই—

ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

১১. চূর্ণবিচূর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

১২. তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা এক সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।

উপরের বক্তব্যগুলি ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের। তারা বিস্ময়ভরে দুনিয়াতে এসব কথা বলত। কেননা তাদের স্থূলবুদ্ধিতে পরকালের কথা আসে না। তাদের এসব কথাগুলি কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন (বনী ইসরাঈল ১৭/৪৯, ৯৮; ক্বাফ ৫০/৩; ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৪৭-৪৮ প্রভৃতি)।

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ

১৩. এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ

এখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা যে বিষয়টিকে বিরাট ও অসম্ভব বলে মনে করছে সেটা আমার ব্যাপক ক্ষমতার আওতাধীনে খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। এটা তো শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। এর ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি শিঙ্গায় ফুঙ্কার দিবেন। তাঁর ফুৎকারের সাথে সাথেই আগের ও পরের সবাই জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সামনে এক ময়দানে সমবেত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ “যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা তার প্রশংসা করতে করতে জবাব দিবে এবং জানতে পারবে যে, খুব অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান করেছো।" (কুরআন ১৭:৫২)

আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমার আদেশ এতো কম সময়ের মধ্যে পালিত হবে যে, ঠিক যেন চোখের পলক ফেলার সময়।” (কুরআন ৫৪:৫০) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ “কিয়ামতের আদেশ চোখের পলক ফেলার মত সময়ে কার্যকরী হবে, বরং এর চেয়েও কম সময়ে।” (কুরআন ১৬:৭৭) এখানেও বলা হয়েছেঃ “এটা তো এক বিকট শব্দের বিলম্ব মাত্র, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।” ঐদিন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ ভীষণ ক্রুদ্ধ হবেন। এই শব্দও ক্রোধের সাথেই হবে। এটা হলো, শেষ ফুকার, যেই ফুঙ্কারের পরেই সমস্ত মানুষ জমীনের উপরে এসে পড়বে। অথচ এর পূর্বে তারা ছিল মাটির নীচে।

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

১৪. তৎক্ষনাৎ তারা ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত হবে।

ساهرة -এর (শাব্দিক অর্থ হলঃ জাগরণভূমি) এখানে এর উদ্দেশ্য হল যমীনের উপরিভাগ; অর্থাৎ, ময়দান। যমীনের উপরিভাগকে ساهرة এই জন্য বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণীর শয়ন ও জাগরণ এই যমীনের উপরই হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, যেহেতু বৃক্ষহীন ময়দান এবং মরুভূমিতে নানা ভয়ের কারণে মানুষের নিদ্রা উড়ে যায় এবং তারা জেগে থাকে, সেহেতু অনুরূপ ময়দানকে ساهرة বলা হয়। (ফতহুল ক্বাদীর) মোট কথা, এ হল কিয়ামতের দৃশ্য-বিবরণ যে, একটি ফুৎকারের ফলেই সমস্ত মানুষ একটি ময়দানে জমায়েত হয়ে যাবে।

هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ مُوۡسٰى

১৫. আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

১৫-২৬ আয়াত পর্যন্ত ১২টি আয়াতে আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে বিগত নবী মূসা (আঃ) ও অবিশ্বাসী সম্রাট ফেরাঊনের মধ্যকার ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, মূসার মধ্যে মিসরীয় জাতিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার দরদভরা মন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ফেরাঊন ও তার কওমের নেতৃবৃন্দ মূসাকে অমান্য করেছিল এবং তাঁকে ও তার কওম বনু ইস্রাঈলকে বর্বরতম নির্যাতনের সম্মুখীন করেছিল। এতদসত্ত্বেও মূসা (আঃ) অসীম ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। অবশেষে অহংকারী ফেরাঊন ও তার সহযোগীদের উপরে আল্লাহর এমন গযব নেমে এসেছিল, যার তুলনা নেই। অতএব মুহাম্মাদ (সাঃ) যেন মক্কার মুশরিক নেতাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে অধৈর্য না হয়ে পড়েন। সবকিছু আল্লাহর চোখের সামনে ঘটছে। তিনিই সময়মত ব্যবস্থা নেবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা স্বরূপ মূসা ও ফেরাঊনের বিগত ঘটনাবলী শুনিয়ে বলছেন, 'তোমার নিকটে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি'?

اِذۡ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًى

১৬. যখন তাঁর রব পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'য় তাকে ডেকে বলেছিলেন,

এটি ঐ সময়কার ঘটনা, যখন মূসা (আঃ) মাদয়ান শহর থেকে ফিরার পথে আগুন খোঁজার জন্য ত্বূর পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গাছের অন্তরাল থেকে আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। যেমন, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা ত্বাহার শুরুতে রয়েছে। 'তুয়া' ঐ জায়গাকেই বলা হয়। কথোপকথনের উদ্দেশ্য হল, রিসালাত ও নবুঅত দানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করা। অর্থাৎ, মূসা (আঃ) আগুন আনার জন্য গেলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে রিসালাত দান করলেন।

اِذۡهَبۡ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰى

১৭. ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে,

অর্থাৎ আল্লাহ মূসাকে ডাকলেন ও বললেন, তুমি ফেরাঊনের কাছে যাও। কেননা সে সীমালংঘনের চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে। ফেরাঊনের সীমালংঘন প্রক্রিয়াটি কেমন ছিল? আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ফেরাঊন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে সে হীনবল করেছিল। তাদের পুত্র সন্তানদের সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত' (ক্বাছাছ ২৮/৪)।

فَقُلۡ هَلۡ لَّكَ اِلٰٓى اَنۡ تَزَكّٰى

১৮. অতঃপর বলুন, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—

অর্থাৎ তুমি কি আল্লাহর অবাধ্যতার পথ ছেড়ে আনুগত্যের পথে ফিরে আসতে চাও, যা তোমাকে পবিত্র করবে? এখানে تَزَكّٰى ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যা মূলতঃ 'তাযকিয়ায়ে নফস' বা হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়। একজন বাদশাহ হিসাবে ফেরাঊন দৈহিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু তার হৃদয়জগত ছিল অবিশ্বাস ও কুফরীর কালিমায় আচ্ছন্ন। যার জন্য সে হয়ে উঠেছিল হঠকারী ও অহংকারী। অতএব তার হৃদয় জগতকে কুফরীর কলুষ ও অন্ধকার থেকে পরিচ্ছন্ন করে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে আহবান জানানোর কথা মূসাকে বলা হল। যেমন অন্যত্র মূসা ও হারূণকে আল্লাহ বলেন, فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى 'তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়তবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' (ত্বোয়াহা ২০/৪৪)

وَ اَهۡدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى

১৯. আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?

একথার অর্থ হচ্ছে, যখন তুমি নিজের রবকে চিনে নেবে এবং তুমি জানতে পারবে যে, তুমি তাঁর বান্দাহ, স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নও তখন অনিবার্যভাবে তোমার দিলে তাঁর ভয় সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহর ভয় এমন একটি জিনিস যার ওপর দুনিয়ার মানুষের সঠিক ও নির্ভুল দৃষ্টিভংগী গ্রহণ নির্ভর করে। আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর ভয় ছাড়া কোন প্রকার পবিত্রতা ও শুদ্ধ আত্মার কল্পনাই করা যেতে পারে না।

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى

২০. অতঃপর তিনি তাকে (মূসা) মহানিদর্শন দেখালেন।

সেই মহা নিদর্শন হল লাঠি ও জ্যোতি বিকীরণকারী হস্ততালু, যা নবুঅত প্রদানকালে তূর পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহ মূসাকে দিয়েছিলেন। এ দু'টি ছিল মু'জেযা, যাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারুরই ছিল না। সে যুগে মিসর ছিল জাদুবিদ্যার কেন্দ্রভূমি। সেকারণ আল্লাহ মূসাকে এরূপ মু'জেযা দান করেছিলেন। যা দেশের সেরা জাদুকরদের হতবাক করে দিয়েছিল এবং পরাস্ত হয়ে তারা সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল (শো'আরা ২৬/৪৭-৪৮)। যদিও ফেরাঊন তাদের সবাইকে হত্যা করেছিল (শো'আরা ২৬/৪৯-৫১)। তবে ফেরাঊন এমন ভীত হয়েছিল যে, কখনোই মূসা ও হারূণের ক্ষতি করার সাহস করেনি। বস্তুতঃ এই দু'টি মু'জেযাই ছিল ফেরাঊনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সেফগার্ড বা রক্ষাকবচ স্বরূপ। এ দু'টি প্রধান মু'জেযা ছাড়াও অন্যান্য সকল নিদর্শন, জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও যুক্তিতর্ক সবই মূসা ও হারূণ পেশ করেন।

فَكَذَّبَ وَ عَصٰى

২১. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্য হল।

অর্থাৎ অন্তরে সে মূসাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল এবং বাহ্যিক কর্মে তার অবাধ্যতা করল। এভাবে ফেরাঊন ভিতরে-বাইরে মূসার দাওয়াতকে অমান্য করল। সে মুনাফিক ছিল না। বরং বিশ্বাসে ও কর্মে সর্বাত্মকভাবে সে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى

২২. তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল।

অর্থাৎ, সে ঈমান ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না; বরং যমীনে ফাসাদ ছড়ানোতে এবং মূসা (আঃ)-এর মুকাবিলা করতে প্রচেষ্টা চালালো। সুতরাং সে যাদুকরদেরকে উপস্থিত করে মূসা (আঃ) এর মুকাবেলা করালো; যাতে মূসা (আঃ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা যায়।

فَحَشَرَ فَنَادٰى

২৩. অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল,

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

২৪. অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।

রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে দেশের জনগণের ভালমন্দ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করার কারণেই সে স্থূল অর্থে নিজেকে 'সবচেয়ে বড় পালনকর্তা' বলেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,'ফেরাঊন তার জনগণকে ডেকে একথা বলেছিল যে, মিসরের বাদশাহী কি আমার নয়? এই নদীগুলি আমার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত। তোমরা কি দেখো না'? (যুখরুফ ৪৩/৫১)। আর সেকারণেই জনগণের উপাস্য হবার দাবী করেছিল। অন্ধ-কালা-বোবা মূর্তিগুলো যদি মানুষের উপাস্য হতে পারে, তবে দেশের রাজা হিসাবে ফেরাঊন কেন জনগণের উপাস্য হতে পারবে না? যদিও এরূপ দাবী কেউ কখনো করেনি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তার অত্যন্ত গর্হিত ও হঠকারী দাবী।

এটুকু বলেই সে ক্ষান্ত হয়নি। সে মূসা (আঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটুক্তি ও তাঁর দরিদ্রতাকেও তাচ্ছিল্য করেছিল। কেননা মূসার যবানে কিছুটা জড়তা ছিল। যেমন ফেরাঊন বলেছিল, - 'আমি তো শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি হতে যে নিকৃষ্ট। এমনকি যে স্পষ্টভাবে কথা বলতেও অক্ষম'। '(যদি সে নবী হত) তাহলে কেন তাকে দেয়া হলো না সোনার বালা সমূহ এবং কেন

তার সাথে আসলো না দলবদ্ধভাবে ফেরেশতারা'? 'এভাবে সে তার কওমকে হতবুদ্ধি করে ফেলল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। বস্তুতঃ তারা তো ছিল সব অবাধ্য সম্প্রদায়' (যুখরুফ ৪৩/৫২-৫৪)।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى

২৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।

ফেরাঊনের সীমালংঘন চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করে যাবার পর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। দুনিয়াতে তার পাকড়াও ছিল সসৈন্যে সলিল সমাধি (বাক্বারাহ ২/৫০; ইউনুস ১০/৯০-৯২)। আর পরকালের পাকড়াও হ'ল জাহান্নামের সর্বোচ্চ ও মর্মান্তিক শাস্তি। এটা ছিল তার সীমালংঘনের প্রতিফল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

২৬. নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে।

ফেরাঊনের উক্ত পরিণতির কথা বর্ণনার পর আল্লাহপাক ইঙ্গিত দিলেন যে, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য এর মধ্যে যেমন উপদেশ রয়েছে, আল্লাহদ্রোহী লোকদের জন্য তেমনি হুঁশিয়ারি রয়েছে। যেন ফেরাঊনী আচরণ করে কেউ নিজেকে শাস্তির ঊর্ধ্বে মনে না করে। যারা শয়তানের পূজা করে এবং মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, তাদের পরিণতিও যুগে যুগে ফেরাঊনের মতই হবে। ইহকাল ও পরকালে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না (ক্বাছাছ ২৮/৪১)। এর মাধ্যমে মক্কার কাফের নেতাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং রাসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করেন, যেমন মূসা (আঃ) ফেরাঊনের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, ফেরাঊনের পরিণতির মধ্যে উপদেশ রয়েছে সকল যুগের আল্লাহভীরুদের জন্য।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰٮهَا

২৭. তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন;

কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

এখানে মরে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে, কাফেরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এখানে সৃষ্টি করা মানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।" [সূরা ইয়াসীন: ৮১] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ "অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। [সূরা গাফির: ৫৭ আয়াত] [ইবন কাসীর]

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰٮهَا

২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

এখানে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১- ছাদ ২- উচ্চ করা ৩- সুবিন্যস্ত করা।

(১) আকাশ হল পৃথিবীর জন্য ছাদের মত। গৃহের উপরকার নিরাপত্তা কাঠামোকে ছাদ বলা হয়। আকাশ তেমনি পৃথিবী ও এখানকার জীব জগতের জন্য নিরাপত্তা কাঠামো হিসাবে কাজ করে।

(২) 'ছাদকে সুউচ্চ করেছেন'। সাধারণতঃ ছাদ উঁচুই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে 'উঁচু করা হয়েছে' বলার অর্থ আকাশরূপী ছাদকে বিশেষভাবে উঁচু করা হয়েছে বান্দার বিশেষ কল্যাণের জন্য।

(৩) ‘তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন’। অর্থাৎ সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। তাতে কোন ফাটল বা ছিদ্র নেই (মুল্ক ৬৭/৩-৪)। এক্ষণে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী কোটি কোটি বছর পূর্বে মহাশূন্যে সংঘটিত বিগব্যঙ বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যদি আকাশ ও বিশ্বলোকের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তথাপি একথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলো সব সুনির্দিষ্ট দূরত্বে পতিত হবে এবং সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে সুনির্দিষ্ট গতিবেগে লক্ষ কোটি বছর ধরে একই নিয়মে সন্তরণশীল থাকবে। অকল্পনীয় গতিবেগে আবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও কোন নক্ষত্রের সাথে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের কখনোই কোন এক্সিডেন্ট বা সংঘর্ষ হয় না। সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত সুন্দরতম পরিকল্পনার ফসল। তিনিই আকাশমন্ডলকে পৃথিবীর জীবকুলের কল্যাণে সুসজ্জিত করেছেন। নিঃসন্দেহে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত। আল্লাহর এই সৃষ্টির এবং এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না (রূম ৩০/৩০; ফাত্বির ৩৫/৪৩)। সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী।

وَ اَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَ اَخۡرَجَ ضُحٰهَا

২৯. আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক;

وَ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا

৩০. আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন।‘

“এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন”-এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কেননা, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার ২৯ নং আয়াতে। কিন্তু এ আয়াতে আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কেননা, পৃথিবী সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বে হলেও পৃথিবী বিস্তৃতকরণ, পানি ও তৃণ বের করা, পাহাড় স্থাপন ইত্যাদি করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর। [ইবন কাসীর]

اَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَ مَرۡعٰهَا

৩১. তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি,

وَ الۡجِبَالَ اَرۡسٰهَا

৩২. আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;

مَتَاعًا لَّكُمۡ وَ لِاَنۡعَامِكُمۡ

৩৩. এসব তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর ভোগের জন্য।

বর্ণিত আয়াত তিনটি পূর্ববর্তী ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং সেখান থেকে নদী-নালা, গাছ-পালা উদ্গত করেছেন ও পাহাড়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর কল্যাণার্থে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীকে এবং আকাশমন্ডলকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র মানুষের সেবা ও মঙ্গলের জন্য।

مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ‘তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশু সমূহের কল্যাণের জন্য’। এখানে গবাদিপশুকে একই বাক্যে বর্ণনার মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গবাদিপশুকে আল্লাহ মানুষের সেবার জন্য ও তা থেকে উপকার লাভের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ‘তোমাদের জন্য গবাদিপশু সমূহের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে পান করিয়ে থাকি তাদের উদরস্থিত বস্তু (দুধ) থেকে। এদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা এবং তোমরা এদের কতককে ভক্ষণ কর’। ‘তোমরা এদের পিঠে ও নৌযানে আরোহণ করে থাক’ (মুমিনূন ২৩/২১-২২)। শুধু তাই নয়, শক্তিশালী এইসব পশুকে আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগত ও তাদের জন্য খাদ্যের উপযোগী করে দিয়েছেন (হজ্জ ২২/৩৬; ইয়াসীন ৩৬/৭২) যাতে মানুষ এদের থেকে সহজে উপকার লাভ করতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী মানুষের জন্য ভোগ্যবস্তু। কোন পূজার বস্তু নয়। বরং এগুলি মানুষের কল্যাণ লাভের ও প্রাণীজ খাদ্যের উৎস মাত্র। অথচ হতভাগা মানুষ গাভী, সাপ ইত্যাদির পূজা করে থাকে। অতএব ‘জীব হত্যা মহাপাপ’ ‘সর্বজীবে দয়া’ ইত্যাদি নীতিবাক্য স্রেফ অসার ও মনগড়া মাত্র।

আকাশমন্ডল ও বিশ্বলোকের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা শেষে এক্ষণে আল্লাহ বিচার দিবসে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের কৃতকর্ম স্মরণ ও দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন (৩৪-৪১ আয়াত)।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الۡكُبۡرٰى

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে

এই মহাসংকট ও বিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ-জন্য এখানে "আত-তাম্মাতুল কুবরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "তাম্মাহ" বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ, বিপর্যয় ও সংকট বুঝায় যা সবকিছুর উপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে "কুবরা" (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ, সংকট ও বিপর্যয় হবে অতি ভয়াবহ ও ব্যাপক।

يَوۡمَ يَتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ مَا سَعٰى

৩৫. মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে

وَ بُرِّزَتِ الۡجَحِيۡمُ لِمَنۡ يَّرٰى

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য,

অর্থাৎ যেদিন প্রত্যেকে নিজের আমলনামা দেখবে এবং নিজের কৃতকর্মের রেকর্ড তার সামনে ভেসে উঠবে, তখন অবিশ্বাসী ও দুষ্কর্মপরায়ণ লোকেরা অনুতাপে ও অনুশোচনায় পুড়তে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' (ইসরা ১৭/১৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,- 'সেদিন মানুষ (তার কৃতকর্ম) স্মরণ করবে। কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?' (ফজর ৮৯/২৩)।

প্রত্যেক কাফেরদের সম্মুখে তা উপস্থিত করে দেওয়া হবে। যাতে তারা দেখতে পায় বা বুঝে নেয় যে, তাদের এখন থেকে চিরকালের জন্য ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কোন কোন আলেম বলেন যে, মু'মিন এবং কাফের উভয়ই জাহান্নামকে দেখবে। মু'মিনগণ তা দেখে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে, তিনি আমাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে এ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর কাফেররা প্রথম থেকেই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং তা দেখে তাদের দুঃখ ও আফসোস আরো বৃদ্ধি পাবে।

فَاَمَّا مَنۡ طَغٰى

৩৭. সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে,

وَ اٰثَرَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا

৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

فَاِنَّ الۡجَحِيۡمَ هِىَ الۡمَاۡوٰى

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাস।

অত্র আয়াতেগুলোতে জাহান্নামী ও জান্নাতী প্রত্যেকের দু'টি করে প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। জাহান্নামী যারা হবে দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হবে 'সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, আর পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেবে অর্থাৎ আখেরাতের কাজ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দিবে; তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাহান্নামই তার আবাস বা ঠিকানা।

وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰى

৪০. আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে,

فَاِنَّ الۡجَنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰى

৪১. জান্নাতই হবে তার আবাস।

অত্র আয়াতে জান্নাতী বান্দাদের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এক- সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি বজায় রাখা এবং দুই- নিজেকে নফ্সের পূজা হ'তে বিরত রাখা। দুনিয়াতে যারা উক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করে দিবে, আখেরাতে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। অর্থাৎ শুরু থেকেই সে জান্নাতী হবে এবং জান্নাতই তার একমাত্র ঠিকানা হবে।

উল্লেখ্য যে, 'নফস' তিন প্রকার : ১- নফসে আম্মারাহ (প্রবৃত্তি পরায়ণ নফস; ইউসুফ ১২/৫৩)। ২- নফসে লাউয়ামাহ (তিরষ্কারকারী নফস; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১-২)। ৩- নফসে মুত্বমাইন্নাহ (প্রশান্ত হৃদয়; ফজর ৮৯/২৭-৩০)। মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে সর্বদা এ তিনটি নফসের উপস্থিতি বুঝতে পারে। সর্বদা নফসে আম্মারাহকে দমিত রাখাই তার কর্তব্য।

জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা শেষে অতঃপর ক্বিয়ামত কবে হবে তার জওয়াব এবং সে সময় লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়টি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন (৪২-৪৬ আয়াত)।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে?

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا

৪৩. তা আলোচনার কি জ্ঞান আপনার আছে?

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا

৪৪. এর পরম জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বলুন, "এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাবেন; ওটা আকাশমন্ডলী ও যমীনে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। হঠাৎ করেই উহা তোমাদের উপর আসবে।' আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, "এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। [সূরা আল-আরাফ: ১৮৭] এখানে ঠিক এটাকে বলা হয়েছে যে, এর পরম জ্ঞান রয়েছে আপনার রবের কাছেই। হাদীসে জিবরীল নামক প্রসিদ্ধ হাদীসেও জিবরাঈলের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না"। [বুখারী: ৫০]

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا

৪৫. যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারী।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا

৪৬. যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!

অর্থাৎ, তোমার কর্ম শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করা; গায়বের খবর দেওয়া নয়। আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞানও গায়বী খবরের অন্তর্ভুক্ত; যা আল্লাহ কাউকেও অবগত করান নি। من يخشاها (যে ওর ভয় রাখে) বাক্য এই জন্য ব্যবহার হয়েছে যে, ভীতি প্রদর্শন ও তাবলীগ থেকে উপকৃত কেবল সেই ব্যক্তি হতে পারে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। নচেৎ ভীতিপ্রদর্শন এবং তাবলীগ তো সকলকেই করা হয়েছে।

عشية যোহর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ضحى সূর্যোদয় থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত সময়কে বলা হয়। অর্থাৎ, যখন কাফেররা জাহান্নামের আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন দুনিয়ার আরাম-বিলাসিতা এবং তার মজা সব কিছু ভুলে যাবে। আর তাদের এমন মনে হবে যে, তারা দুনিয়াতে পুরো একটি দিনও অবস্থান করেনি; বরং দিনের প্রথম ভাগ অথবা শেষ ভাগ কেবলমাত্র অবস্থান করেছিল। অর্থাৎ, পার্থিব জীবনটা তাদের কাছে খুবই স্বল্পক্ষণের মনে হবে।

ফুটনোট

প্রথম পর্ব: মহাজাগতিক শক্তির শপথ এবং পুনরুত্থানের অনিবার্যতা

সূরার সূচনা হয় এক অত্যন্ত গতিময়, শক্তিশালী এবং রহস্যময় শপথের ধারার মাধ্যমে। আল্লাহ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োজিত ফেরেশতাদের শপথ করে পুনরুত্থানের অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠা করছেন।

পাঁচটি শক্তিশালী শপথ:

১. শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা (অবিশ্বাসীদের আত্মাকে) কঠোরভাবে উৎপাটন করে,

২. শপথ তাদের, যারা (বিশ্বাসীদের আত্মাকে) মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে,

৩. শপথ তাদের, যারা (আল্লাহর আদেশে) তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,

৪. অতঃপর শপথ তাদের, যারা (অন্যদেরকে) পিছনে ফেলে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়,

৫. এবং শপথ তাদের, যারা (আল্লাহর নির্দেশে) সকল কার্য সম্পাদন করে।

এই গতিময় ও শক্তিশালী শপথের পর আল্লাহ সেই অবশ্যম্ভাবী দিনের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন, যেদিন পুনরুত্থান ঘটবে।

মহাপ্রলয়ের দৃশ্য:

- "যেদিন প্রকম্পিতকারী (প্রথম ফুৎকার) সবকিছুকে প্রকম্পিত করবে,"
- "এবং তার অনুগামী হবে পরবর্তী (দ্বিতীয় ফুৎকার)।"
- "সেদিন বহু অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।"
- "তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত।"

এই ভয়াবহ বাস্তবতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাসীরা, যারা উপহাস করে বলে: "আমরা কি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব? যখন আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিতে পরিণত হব, তখনও?"

দ্বিতীয় পর্ব: ইতিহাসের প্রতিধ্বনি: মুসা (আলার) ও ফেরাউনের উপাখ্যান

অবিশ্বাসীদের এই পুনরুত্থান অস্বীকারের জবাবে, আল্লাহ ইতিহাসের পাতা থেকে এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, যা ঔদ্ধত্য ও তার পতনের এক জীবন্ত উপাখ্যান–মুসা (আলার) ও ফেরাউনের কাহিনী।

পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান:

"তোমার কাছে কি মুসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?" যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন: "তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"

ফেরাউনের ঔদ্ধত্য:

মুসা (আ) ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানান এবং তাঁকে এক মহান নিদর্শন (লাঠির সাপে পরিণত হওয়া) দেখান। কিন্তু ফেরাউন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অবাধ্যতা করে।

ক্ষমতার দম্ভ:

অতঃপর সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সে তার লোকদের সমবেত করে এক দম্ভভরে ঘোষণা দেয়: "আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক!"

অনিবার্য পরিণতি:

তার এই চরম ঔদ্ধত্যের ফলে, "আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।"

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই এতে সেই ব্যক্তির জন্য এক বড় শিক্ষা রয়েছে, যে ভয় করে।"

তৃতীয় পর্ব: সৃষ্টিজগতের বিশালতা এবং মানুষের তুচ্ছতা

ফেরাউনের এই করুণ পরিণতির পর, আল্লাহ এবার মানুষকে তার নিজের অস্তিত্ব এবং মহাবিশ্বের বিশালতার মধ্যে তুলনা করতে বলেন, যা তার অহংকারকে চূর্ণ করে দেয়।

এক শক্তিশালী প্রশ্ন:

"তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন, নাকি আকাশকে? তিনিই তো তা নির্মাণ করেছেন।"

মহাবিশ্বের নিখুঁত কারুকার্য:

- "তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।"
- "এবং তিনি তার রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিবালোককে প্রকাশ করেছেন।"
- "আর পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত করেছেন।"
- "তিনি তা থেকে তার পানি ও চারণভূমি নির্গত করেছেন।"
- "এবং পর্বতমালাকে তিনি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।"

এই সবকিছুই মানুষের ও তার চতুষ্পদ জন্তুর জীবন ধারণের জন্য। এই বিশাল সৃষ্টিজগতের তুলনায় মানুষের পুনরুত্থান কি কোনো কঠিন কাজ?

চতুর্থ পর্ব: সেই মহাসংঘটন এবং দুই দলের চূড়ান্ত ঠিকানা

এই যৌক্তিক প্রমাণের পর, সূরাটি এবার সেই চূড়ান্ত দিনের দিকে ফিরে আসে, যাকে বলা হয়েছে "আত-তাম্মাতুল কুবরা" বা সেই মহাসংঘটন।

কর্মের স্মরণ:

"অতঃপর যখন সেই মহাসংঘটন (কিয়ামত) এসে যাবে, সেদিন মানুষ তার সকল কৃতকর্ম স্মরণ করবে।"

এরপর দুটি দলের চূড়ান্ত ও ভিন্ন পরিণতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়:

১. সীমালঙ্ঘনকারীদের ঠিকানা (জাহান্নাম):

- "সুতরাং, যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছিল,"
- "এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল,"
- "তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

২. আল্লাহভীরুদের ঠিকানা (জান্নাত):

- "আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছিল,"
- "এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছিল,"
- "তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"

পঞ্চম পর্ব: কিয়ামতের জ্ঞান এবং চূড়ান্ত বার্তা

সূরার শেষাংশে আল্লাহ কিয়ামতের সময়কাল সম্পর্কে মানুষের কৌতুহলের জবাব দেন।

কিয়ামতের সময়:

- "তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, 'তা কখন ঘটবে?'"
- "সে বিষয়ের আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক?"
- "এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে।"

রাসূলের (ﷺ) প্রকৃত দায়িত্ব:
"তুমি তো কেবল সেই ব্যক্তিকে সতর্ককারী, যে তাকে ভয় করে।"

অবশেষে, সূরাটি শেষ হয় এক শক্তিশালী উপমার মাধ্যমে, যা দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বকে তুলে ধরে:
"যেদিন তারা তা (কিয়ামত) দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন (দুনিয়াতে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থানই করেনি।"